উপসংহার

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার মূল্যায়ন

উপসংহার

রবীন্দ্রকাব্যধারায় কাহিনীমূলক কবিতার মূল্যায়ন

পূর্বাপর আলোচনাসূত্রে অবশেষে কাহিনীমূলক কাব্য ও কবিতাবলীর মূল্যায়ন প্রয়োজন। দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ঘরের কোণের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়, প্রতিদিনের পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যেকার অতি সাধারণ বিষয় আবার ভারতের অতীতের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় আদর্শ, ব্যক্তিগত আদর্শ ইত্যাদিকে তাঁর কবিতার বিষয়রূপে নির্বাচন করে পাঠক-সম্প্রদায়কে কাহিনীমূলক কবিতা উপহার দিয়েছেন এবং পাঠককে কাহিনী পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছেন। তবে সাহিত্য জীবনের এই ভিন্ন প্রবাহটি যে কবিগুরুর কোনো সচেতন বা সজাগ প্রয়াসের ফলশ্রুতি তা মনে করা সঙ্গত হবে না। কারণ পাঠকমাত্রেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ছিল একান্তভাবেই গীতিকবির প্রতিভা। সরল সাবলীল গীতিবহুল ছন্দের মধ্যে সুরের মূর্ছনা ফুটিয়ে তোলা, স্বল্পের মধ্য দিয়ে, অব্যক্তের মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়কে গভীরতা দান করা, খণ্ডের মাধ্যমে পূর্ণতা সৃষ্টি করা ও সর্বোপরি কবিতার সমাপ্তিতে অশেষের রেশ সৃষ্টি করা — একজন গীতিকবিরই সুস্পষ্ট লক্ষণ। তবে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীমূলক কবিতা ও গদ্যিক ছোটগল্পগুলির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যই বিরাজমান। আবার কবি চিত্তের একেকটা বিশেষ ভাব বা 'মুড' থেকেই তাঁর বেশিরভাগ কাহিনীকবিতা অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকবিতাগুলিকে গীতিকবিতার সহোদর আখ্যায়িত করা চলে। এই বিশেষ ধর্মই আবার কবিসৃষ্ট ছোটগল্পগুলির প্রাণ। খুব ভালো ভাবে অনুধাবন করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি গীতিকবিতারই আর একটি দিক — অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটগল্পগুলি যেন কাহিনীকবিতাগুলিরই গদ্যরূপ। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের অঙ্গনে গীতিকবিতা, কাহিনীমূলক কবিতা এবং ছোটগল্প যে পরস্পর আত্মীয় একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের আর একটি বিস্ময় — নাট্য কবিতা বা নাট্যকাব্য। সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে কবি তাঁর সৃষ্ট কাহিনীকবিতাকেই নাট্যরূপ দিয়েছেন; তবে তা কবিতার আধারে।

রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারের সূচনা কিন্তু কবিতার হাত ধরে; অবশ্যই তা দীর্ঘ কাহিনীমূলক কবিতা। যদিও এতে কবির স্বীয় প্রকৃত কবিধর্মটি অনুপস্থিত ছিল; একপ্রকার অনুকরণপ্রিয়তা ছিল, অনভিজ্ঞ জীবনপ্রেম ছিল, তবুও কবির ভাবপ্রকাশের মূল মাধ্যমটি যে কাহিনীকবিতা ছিল তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ইত্যাদি সবই তো কাহিনীকবিতা। প্রথম দিকের কাহিনীকবিতাগুলির পাশাপাশি কোন ছোটগল্পের জন্ম হয়নি। এর সঙ্গত কারণ ছিল। ছোটগল্প রচনার জন্য যে জীবনকে গভীরভাবে জানা প্রয়োজন সে অভিজ্ঞতা

কিন্তু তখন কবির ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির আবেগপ্রবণ মনোধর্মটি। বাড়ির চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকায় কবি কখনোই বহির্জগতের কাছাকাছি আসতে পারেননি। তাই মানব ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সে কারণে সেই সময়কার কাব্যে বিধৃত কবিতায় তাঁর অবাধ আবেগতাড়িত কল্পনাপ্রবণ মনের মুক্তপক্ষসঞ্চরণ ছিল। তবে এর দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে চলেছিল কাহিনীকবিতা, গল্পবীজভিত্তিক কবিতা। এর প্রধান কারণ বোধহয় গল্পের ধারাকে মূল স্রোতে এগিয়ে নিয়ে চলার পাশাপাশি অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চালানো।

কাহিনীকবিতাগুলির পাশাপাশি ছোটগল্প রচনার বান ডাকলো 'সোনার তরী' পর্বে এসে। এ সময় জমিদারি তদারকির সূত্রে তিনি মানুষের জীবন ও জগতের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হলেন। আর এই অভিজ্ঞতাই ছোটগল্পের সুসজ্জিত ডালি উপহার দিল পাঠককে। বিশেষত যে মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভাকে গীতধর্মী করেছে, সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে গোড়ার দিকে ছোটগল্পের উৎসের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর বেশিরভাগ গল্প রচিত হয়েছিল মোটামুটিভাবে ১২৯৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৩১০ সালের মধ্যে। অবশ্য তারপর ১৩১৪ সাল থেকে ১৩২৫ সালের মধ্যে বেশ ক'টি সুপ্রসিদ্ধ ছোটগল্প রচিত হয়েছিল। তবে ঐ ১২৯৮-১৩১০ সাল পর্যন্ত সময় কবিজীবনের স্বর্ণযুগ। 'সোনারতরী' থেকে আরম্ভ করে 'চিত্রা' 'চৈতালি', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা' ইত্যাদি কাব্যে বিধৃত কবিতায় লক্ষ্য করা যায় যে জগতের তুচ্ছতম জিনিসও যেমন কবির দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি অতীত ইতিহাস, মানব-ধর্ম, মানব-আদর্শ ইত্যাদিও কবির মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। জলে হাঁসের খেলা, গ্রামের মেয়ের ঘাটে বসে অঙ্গের বসন ফেলে দিয়ে গা ঘসা, নদীর চরে বসে কোনো এক লোকের বাখারী চাঁছা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে তিনি যখন অপার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে মুগ্ধ হলেন তখন মনের এই ভাব প্রকাশের জন্য কাহিনী বা গল্পকে হাতিয়ার করলেন। আবার পাশাপাশি অতীত ইতিহাসের আদর্শের বিভিন্ন কাহিনী কবির মনকে মুগ্ধ করলো। সেই সব গল্প পদ্যছন্দে রচিত হতে থাকলো।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ জরুরি যে ছোটগল্পের সূতিকাগার হিসাবে সেযুগের পত্রপত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ সময় কবির মনের একদিকে যেমন ছিল উপলব্ধ বিষয়কে গাল্পিক রূপদানের প্রবণতা তেমনি অন্যদিকে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার চাহিদা মেটাতে রবীন্দ্রনাথকে একেরপর এক ছোটগল্প সৃষ্টি করতে হয়েছে। বহির্জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আত্মিক যোগস্থাপন ছিল অন্তরঙ্গ প্রেরণা; বহিরঙ্গ প্রেরণা ছিল সাময়িক পত্রপত্রিকার দাবি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে কর্মব্যস্ত মানুষের সংক্ষিপ্ত অবসরে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনী পড়ার দাবি। বস্তুত এসময় কাহিনীকবিতা রচনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ৪৩টি ছোটগল্প। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের বহুপঠিত জনপ্রিয় গল্পের অধিকাংশই এই সময়সীমায়

লেখা। 'হিতবাদী'তে তিনি প্রথম সার্থক ছোটগল্প লিখেছিলেন — 'দেনাপাওনা' (১২৯৮)। তার আগে অবশ্য 'ভিখারিনী' (১২৮৪), 'ঘাটের কথা' (১২৯১), 'রাজপথের কথা' (১২৯১), 'মুকুট' (১২৯২) — এই চারটি গদ্য-কাহিনী লিখেছিলেন। তবে সেগুলি বলিষ্ঠ-দেহ সার্থক ছোটগল্প নয়। 'হিতবাদী'তে প্রকাশ পেল পরপর সাতটি সার্থক ছোটগল্প — 'দেনাপাওনা' (১২৯৮), 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮), 'গিন্নি' (১২৯৮), 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'ব্যবধান' (১২৯৮), 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (১২৯৮), 'খাতা' (১২৯৮)। এরপর 'হিতবাদী'তে মতভেদ হেতু ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ থেকে কবি সদ্য প্রকাশিত 'সাধনা'তে একেরপর এক ছোটগল্প লিখে চললেন। এপর্যায়ে লিখলেন ৩৬টি ছোটগল্প। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'দালিয়া', 'কঙ্কাল', 'মুক্তির উপায়', 'ত্যাগ', 'একরাত্রি', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'শাস্তি', 'অনধিকার প্রবেশ', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি' ইত্যাদি বহুপঠিত গল্পগুলি এ সময়কালে রচিত। বস্তুত শিলাইদহ, সাজাদপুর অঞ্চলে বাসকালে কবি বাংলাদেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে যেভাবে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হয়েছেন, গ্রামের পথঘাট, মানুষজন সকলকে আপনজন বলে জেনেছেন, তারই রূপ দিয়েছেন গল্পগুলিতে। পাশাপাশি রচিত হয়ে চলেছিল বিভিন্ন কাব্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে কাহিনীধর্মী কবিতা বা ছান্দিক বন্ধনে গল্পিকা বা গল্পকণা। 'চৈতালি'র বেশ কিছু কবিতায় যে গল্পাভাস রয়েছে তা একটু প্রসারিত হলেই গদ্য গল্পের রূপ নিত

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যসম্ভার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে গল্প রচনার ধারাটি কবিগুরুর সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম থেকে প্রায় শেষ অবধি বিরাজমান। কবি তাঁর হৃদয়াবেগকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে গল্প বলার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন কখনো ছোটগল্পকে, কখনো বা নাটকবিতা আবার কখনো কাহিনী কবিতাকে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে কবির গল্প বলার প্রয়াস কখনো থেমে থাকেনি। তাই ১৩০৩ সালে 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটগল্প রচনা স্থগিত রাখলেন, তখন সাহিত্যের শাখাটির পরিবর্তন হল মাত্র — রচিত হল ১৩০৪ সালে 'কাহিনী' নাট্যকাব্যের কবিতাগুলি ছোটগল্পের শিল্পিত রূপ প্রকাশ পেল নাট্য-কাহিনীকবিতায়। ১৩০৫ সালে আবার কাহিনীমূলক কবিতা রচনা বন্ধ হল। এসময় তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় গল্পের যোগান দিচ্ছেন। ১৩০৬ সালে আবার কোনো গল্প রচিত হয়নি; পাওয়া গেল 'কথা' কাব্যের একগুচ্ছ কাহিনীমূলক কবিতা। ১৩০৭ সালে লক্ষ করা গেল কাহিনীকবিতার স্রোতে মন্দগতির দোলা। এসময় আটটি ছোটগল্প লিখলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এসময় কবিকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প যোগান দিতে হচ্ছে। এরপরই কবিজীবনের একটি অধ্যায়ের এবং সেই সঙ্গে গল্প রচনার অধ্যায়ে ছেদ পড়েছে। এরপর লক্ষ্য করা যায় কবি তথা গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। জীবনের নানান চিত্রকে বড় ক্যানভাসে একত্রে গথিত করে উপন্যাস রচনা করেছেন কবি ততোদিনে জীবনকে কবি অনেক গভীরভাবে জেনেছেন, অভিজ্ঞতাও লাভ করেছেন বিস্তর। সমাজ জীবন

সম্বন্ধেও চেতনার বিকাশ কম হয় নি। উচ্চবিত্ত -মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বিরোধ ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গেই কবি পরিচিত হয়েছেন; সমসাময়িক কালের ভাবাদর্শও কবির মগ্ন চেতনায় এনে দিয়েছে সেই ভাবাদর্শ ও বাস্তব জীবনধারার নব অনুভূতি। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাহিনীর আকার দান করার মাধ্যম রূপে কবি বেছে নিলেন উপন্যাসকে — রচিত হল 'চোখের বালি' (১৩০৮), 'নৌকাডুবি' (১৩১০-১১) 'গোরা' (১৩১৪-১৫), 'চতুরঙ্গ' (১৩২১) 'ঘরে বাইরে' (১৩২২) 'চার অধ্যায়' (১৩৪১)। এরপর দীর্ঘ বারো আর কবি উপন্যাসের আধারে গল্প বা কাহিনী শোনালেন না।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে ১৩২১ সালেই 'সবুজপত্র'-এর চাহিদা মেটাতে আবার গল্প লিখতে হয়েছে। এটি 'বলাকা' কাব্য রচনা সময়কার কথা। 'বলাকা'র নতুন জীবন ও যৌবনের সুর পাওয়া যায় এই সময়কালে রচিত গল্পগুলিতে। ১৩২৪ সালে লিখলেন ছোটগল্প। এটি 'পলাতকা' কাব্য রচনার সময়কাল। নারীর জীবনের বঞ্চনার কথাকে উপলব্ধি করে তার সঙ্গে নিজের অনুভূতিপ্রবণ ও সমাজমনস্ক মনটিকে যুক্ত করে রচনা করলেন 'পলাতকা'র কাহিনীকবিতাগুলি। এই সময়কালে রচিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে শোনা যায় 'মুক্তি' কাহিনীকবিতার প্রতিধ্বনি।

মনে করা অসঙ্গত হবে যে, এইসময় গদ্যে গল্প রচনার সমাপ্তি হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি গল্প রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন — ১৩৩২-১টি, ১৩৩৫ ২টি, ১৩৩৬-১টি, ১৩৪০-১টি এবং সেই সঙ্গে রচিত হয়েছে দু'টি উপন্যাস — 'যোগাযোগ' (১৩৩৪-৩৫) ও 'শেষের কবিতা' (১৩৩৫)। এখানে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গল্প রচনার ধারা থমকে গেছে। কিন্তু তা নয়; এরপর চলেছে বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় গল্প বলা।

'পুনশ্চ' (১৩৩৯), 'শেষসপ্তক' (১৩৪২), 'শ্যামলী' (১৩৪৩), 'আকাশ প্রদীপ' (১৩৪৬), 'সানাই' (১৩৪৭) কাব্যে পরপর রচিত হয়েছে কাহিনী-কবিতা। তবে একটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের প্রথমদিকে যেসব কাহিনীকবিতা রচনা করেছেন তাতে হৃদয়াবেগকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি; আর শেষ পর্বের কাব্যগুলিতে নিবদ্ধ কাহিনীকবিতায় বড় আসন লাভ করেছে সমাজমনস্কতা, যুক্তি-বুদ্ধি। এর সঙ্গত কারণটি আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। যে অস্পষ্ট জীবনাভিজ্ঞতা আর ভাবাবেগ তাঁর প্রথম দিককার কাহিনীকবিতায় ছিল, শেষ পর্বে তা একেবারেই বিপরীতধর্মিতা লাভ করেছে। কবি বাস্তবের মাটিতে পা রেখে মানুষকে অনুভব করেছেন এবং তাকেই প্রকাশ করেছেন কাহিনীকবিতায়

শেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কবির রচিত কিছু কাহিনীমূলক কবিতা পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্যের রূপ পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের 'পরিশোধ' (শ্যামা-নৃত্যনাট্য), 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শাপমোচন' (শাপমোচন-নৃত্যনাট্য) এর কথা উল্লেখ করা চলে।

কবি-মনের ভাবটিকে, উচ্ছ্বাস ও আবেগকে প্রকাশের আদর্শ মাধ্যম যেমন কবিতা, তেমনি জীবন ও জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপদানের আদর্শ মাধ্যম গল্প বা উপন্যাস। তাই কবিচিত্তে যখন যে 'মুড'টি সক্রিয় ছিল তখনই তার উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে কখনো কাহিনীকবিতা, কখনো ছোটগল্প বা নাট্য-কবিতার আধারে কবি গল্প রচনা করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর গীতিকবিসুলভ আবেগ ও অনুভূতি ক্রিয়াশীল ছিল। অতএব, সাহিত্যের যে মাধ্যমেই হোক না কেন, কবির মূল প্রয়াস ছিল গল্প রচনা। পত্র-পত্রিকা তাঁকে গল্পকার করেছে; মনের তাগিদ তাঁকে করেছিল কবি। কাহিনীকবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের উৎসার; কোনো সুস্পষ্ট শিল্প-আধার সৃষ্টি প্রয়াসের ফলশ্রুতি নয়। সমাপ্তিসূচক মন্তব্যে বলা চলে কাহিনীকবিতা রচনার ধারাটি এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে রবীন্দ্রকাব্যধারায় বিদ্যমান — যাকে আজও অতি মূল্যবান সাহিত্য-কৃতি রূপে গণ্য করা হয়।